শ্রদ্ধাঞ্জলি

সত্যেন্দ্রনাথ বসু : বিরল বিজ্ঞানী বিরল পুরুষ

চিরশ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় ষাট বছর আগের কথা। ১৯৬০ সালের জানুয়ারি মাসে বিশ্ববিশ্রুত নোবেলজয়ী পদার্থবিদ নিলস বোর এসেছেন কলকাতায়, মেঘনাদ সাহা মেমোরিয়াল লেকচার দিতে। সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের হলঘরে তিনি তাঁর বক্তব্য রাখছেন। সভাপতিত্ব করছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। প্রথম সারিতে চোখ বুজে বসেছিলেন তিনি। এরকম মনন করার ভঙ্গিতে প্রায়ই তিনি বসে থাকতেন। ব্ল্যাকবোর্ডে একটি জটিল বিষয় বোঝাতে গিয়ে ইতস্তত করেন বোর। সঠিক ফরমুলাটি তাঁর স্মরণে আসে না। সাহায্য চান সম্মুখে উপবিষ্ট শুভ্রকেশ বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছে। বসু তখনই উঠে দাঁড়ান। বোর্ডে গিয়ে বাকি সমীকরণটুকু সাঙ্গ করেন অনায়াসে এবং আবার একইভাবে ফিরে গিয়ে চোখ বুজে বসে পড়েন নিজ আসনে। আবার চিন্তার জগতে ডুব দেন। চলে যান সাধনা-সাগরের অতলে, যেখানে সবার দৃষ্টির আড়ালে তিনি ইচ্ছেমতো হারিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা রাখেন।

সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম হয়েছিল ১ জানুয়ারি ১৮৯৪, উত্তর কলকাতার সুপ্রতিষ্ঠিত বসু পরিবারে। সেযুগের ইংরেজি-জানা উচ্চশিক্ষিত সুধীজনের মধ্যে গণ্য হতেন তাঁরা। তাঁদের আদি বাসস্থান ছিল নদিয়া জেলার বড় জাগুলিয়া গ্রামে, যে-জেলা সে-সময় উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষা ও মার্জিত আচার-আচরণের জন্য বিখ্যাত ছিল। পিতা সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন স্থিরচিত্ত, একরোখা ও পরিশ্রমী। পেশায় ইস্ট ইন্ডিয়া রেলওয়ের উচ্চপদস্থ কর্মী হয়েও পরে স্বদেশি আন্দোলনে অনুপ্রাণিত হয়ে কর্মে ইস্তফা দিয়ে ১৯০১ সালে খুলেছিলেন নিজস্ব কেমিক্যাল ও ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি। সত্যেন্দ্রনাথের জননী আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুর কোর্টের এক স্বনামধন্য আইনজীবীর কন্যা। তিনি ছিলেন তেজস্বিনী। সেযুগে মেয়েদের শিক্ষাদানের প্রচলন ছিল না, তাই তিনি পুঁথিগত শিক্ষা পাননি। কিন্তু তাঁর ছিল অন্তর্নিহিত উচ্চশিক্ষা, সংস্কৃতি ও সৌষ্ঠব। তাঁর পিতা ছিলেন সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ও দীনেশচন্দ্র সেনের বিশেষ বন্ধু। সেই সংস্কৃতির পরশ ছিল আমোদিনীর মধ্যে। সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন সাত ভাইবোনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ও একমাত্র পুত্রসন্তান। ছোটবেলা থেকেই সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন শান্ত, ভদ্র, নির্লিপ্ত কিন্তু স্পষ্টবাদী। অপরদিকে ছিলেন পিতার মতো বহুমুখী প্রতিভারও অধিকারী। ছিলেন পিতার

মতোই একরোখা ও একাগ্রচিত্ত। সন্তানের জন্য একইসঙ্গে গর্বিত ও শঙ্কিত পিতা ছেলেবেলা থেকেই পুত্রকে চারপাশের বিভ্রান্তি থেকে সরিয়ে রাখতে তৎপর থাকতেন। মেধাবী সন্তানের উন্নত জীবনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী সে-যুগের 'স্বদেশি' ও 'সংগীত' থেকে দূরে থাকতে তিনি পুত্রকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ পিতৃআজ্ঞা প্রকাশ্যে পালন করলেও পরোক্ষে সংগীতকে রেখেছিলেন পাশে, জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। আর শৃঙ্খলিত জন্মভূমির ব্যথাকে হৃদয়ে ধরে রেখেছিলেন, সাহায্য করেছিলেন যেকোনও সাহায্যপ্রার্থী বিপ্লবীকে— সকলের চোখের আড়ালে। সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু অবনী মুখার্জি একদা দেশ থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে ছিলেন প্যারিসে, এমন অবস্থায় তাঁর টাকার প্রয়োজন ছিল। সত্যেন্দ্রনাথ আগে থেকেই জানতেন সেকথা। ইউরোপে থাকাকালীন দেশ থেকে সংগ্রহ করা টাকা নিয়ে তিনি পৌঁছে যান প্যারিসে, বন্ধুকে অর্থসাহায্য করতে। কার্য সমাধা করে ফরাসি রাজধানীর প্রতি আকৃষ্ট বিজ্ঞানী আরও কয়েকদিন সেখানে থেকে অন্যান্য বন্ধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করে ফিরে আসেন।

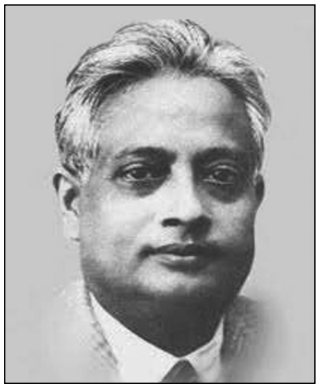

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

হিন্দু স্কুল থেকে পাশ করে সত্যেন্দ্রনাথ ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেইসময় প্রেসিডেন্সি কলেজে চাঁদের হাট; ছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, ডি এন মল্লিক প্রমুখ। মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ শিক্ষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সহজেই। বিজ্ঞানের অসাধারণ ছাত্র হলেও তিনি ছিলেন সাহিত্যানুরাগী, সে-বিষয়ে তাঁর দক্ষতাও ছিল চোখে পড়ার মতো।

সত্যেন্দ্রনাথ বাস্তবিকই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভাশালী এক অনন্য পুরুষ। অজস্র বিষয়ে আগ্রহ ছিল তাঁর। সর্বাধিক ছিল তীক্ষ্ণ বিজ্ঞানমনস্কতা। মাধ্যমিক বিজ্ঞান শ্রেণিতে পড়াকালীন একদিকে তিনি যেমন ত্রিকোণমিতি ও ক্যালকুলাস কষতেন, সেইসঙ্গে গ্যারিবলডি, ম্যাৎসিনির বই পড়তেন, টেনিসনের 'ইন মেমোরিয়াম' থেকে অনর্গল মুখস্থ বলতে পারতেন। কালিদাসের মেঘদূত, রঘুবংশ, কুমারসম্ভবও শেষ করেছিলেন অনায়াসে। এসবের সাধনা চলত মধ্যরাত পর্যন্ত। যখন যে-বিষয় নিয়ে পড়তেন, তাকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত না করা অবধি স্বস্তি পেতেন না তিনি। আই এস সি পরীক্ষার কিছুদিন আগে ক্যারাম খেলা শিখে কিছুদিন তাইতেই মেতে রইলেন। তাই দেখে জননী বললেন, ''পরীক্ষায় তুই ফেল করবি।'' কিন্তু ফল বের হলে দেখা গেল জননীর বচনে কত আশীর্বাদ লুক্কায়িত ছিল—প্রথম হলেন সত্যেন্দ্রনাথ।

প্রেসিডেন্সিতে পড়ার সময় তাঁর মেধার দীপ্তি ছড়িয়ে পড়ে। আই এস সি পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম, মানিকলাল দে দ্বিতীয় ও ঢাকা কলেজ থেকে মেঘনাদ সাহা তৃতীয় স্থান পান। এরপর মেঘনাদ সাহা চলে আসেন প্রেসিডেন্সিতে। যথাক্রমে বি এস সি ও এম এস সি-তে মিশ্র গণিত নিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম ও মেঘনাদ সাহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দুজনের বন্ধুত্ব, প্রতিযোগিতা ও সাফল্যের কাহিনি ক্রমে কিংবদন্তি হয়ে দাঁড়ায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের মূল্যবান দিনগুলিতে তিনি আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও জগদীশচন্দ্র বসুর মতো দুই শিক্ষকস্তম্ভের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন গভীরভাবে। তখন ঘোর স্বদেশি যুগ। বিপ্লব ও প্রতিবাদের আগুনে পুড়ছিল

বাংলা। সত্যেন্দ্রনাথও সেই প্রভাব-বহির্ভূত ছিলেন না। অনুশীলন সমিতির সঙ্গে পরোক্ষ যোগসূত্র ছিল তাঁর। বেশ কিছুদিন তিনি ওয়ার্কিং মেন্‌স ইনস্টিটিউট-এ দিনমজুরদের নৈশ বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে সন্ধে ছটা থেকে রাত্রি নটা পর্যন্ত পড়াতেন। বিদ্যালয়টি ১৯১৮ পর্যন্ত চালু ছিল। তারপর সন্ত্রাসবাদী সন্দেহে ব্রিটিশ পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি পড়ায় সেটি বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে কুড়ি বছর বয়সে উষাবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তখন সত্যেন্দ্রনাথ এম এস সি-র ছাত্র। উষাবতী ছিলেন সেকালের প্রসিদ্ধ ডাক্তার যোগীন্দ্রনাথ ঘোষের একমাত্র সন্তান। তিনি নিবেদিতা স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। মাতৃআজ্ঞায় ঘটিত এই বিবাহে দৃঢ় নীতিবাদী সত্যেন্দ্রনাথের দুটি শর্ত ছিল। প্রথমত তিনি বিয়েতে কোনও পণ নেবেন না, আর দ্বিতীয়ত, বিয়েতে তাঁর দুশো জন বন্ধু বরযাত্রী যাবেন। বলা বাহুল্য তাঁর দুটি শর্তই মেনে নেওয়া হয়েছিল।

সে এক অদ্ভুত সময়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রেক্ষাপটে বাংলার বুকে জ্বলে উঠেছিল নবজাগরণের আলো। 'বেঙ্গল রেনেসাঁ' নামে বিখ্যাত সেই স্বর্ণযুগের এক উজ্জ্বল তারকা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ছাত্রাবস্থায় তিনি যাঁদের সতীর্থরূপে পেয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে মেঘনাদ সাহা, জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নিখিলরঞ্জন সেন, পুলিনবিহারী সরকার প্রমুখ সকলেই পরবর্তী কালে কৃতী বিজ্ঞানী হিসেবে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ বা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এর আগে বা আজ পর্যন্ত এমন মেধাবী তারকা-সমষ্টির সমাবেশ খুব বেশি দেখা যায়নি।

পূর্ণ কৃতিত্বের সঙ্গে ছাত্রজীবনের অধ্যায় শেষ হলে আরম্ভ হয় সত্যেন্দ্রনাথের কর্মজীবন। অতি মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে সামান্য কাজ পাওয়াও দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। তিনি প্রথমে বিহারের পাটনা কলেজে ও পরে কলকাতা মেট্রোলজিকাল অফিসে সামান্য চাকুরির দরখাস্ত করে প্রতিহত হন। তাঁরা জানান, এত বেশি পড়াশোনা জানা মানুষকে জায়গা দিতে তাঁরা ভয় পাচ্ছেন। এইভাবে প্রায় এক বছর কেটে যায়। এরপর আহ্বান আসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য স্যার আশুতোষের কাছ থেকে—বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য স্থাপিত বিজ্ঞান বিভাগে পড়ানোর জন্য। শৈলেন ঘোষ স্যার আশুতোষকে এই ভাবনায় বুদ্ধি জোগান। বলেন, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের সেই সব বিষয় পড়ানো আরম্ভ করতে যেগুলি প্রেসিডেন্সি কলেজে হয় না। অতএব এক নতুন ধারার প্রবর্তন হল। স্বাভাবিকভাবেই মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথের ডাক পড়ল। মাত্র ১২৫ টাকা বেতন বা বৃত্তির বিনিময়ে শিক্ষাদান করতে আরম্ভ করলেন তাঁরা। বিজ্ঞানের নতুন বিষয়গুলিকে দুজনে ভাগ করে নিলেন। সাহা নিলেন Quantum Theory, Thermodynamics and Statistical Mechanics; অপরদিকে বসু নিলেন Theories of Electromagnetism and Relativity। স্যার আশুতোষের বিশাল গ্রন্থাগারকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা গবেষণার কাজও করতে লাগলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ফরাসি জানতেন। এবার জার্মান ভাষাকে করায়ত্ত করতে তৎপর হলেন। এই সময় এই দুই মেধাবী বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের যৌথ প্রচেষ্টায় বিখ্যাত ইংরেজি পত্রিকা 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে' একটি মূল্যবান নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁদের হাতে প্রমাণিত সেই সূত্রটি, সাহা-বোস অবস্থা সমীকরণ (Saha-Bose Equation of State) নামে সুপরিচিত।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও মেঘনাদ সাহা—দুই বিজ্ঞানী তাঁদের সাধনার ধারাকে অব্যাহত রাখেন যথেষ্ট অসুবিধের বেড়াজাল ডিঙিয়ে। সেইসময় শুধু

কলকাতায় কেন, গোটা ভারতবর্ষেই আধুনিক বিজ্ঞানের বই ও জার্নালের সম্পূর্ণ আকাল ছিল, কারণ ভারত তখন পরাধীন। অবশ্য সৌভাগ্যবশত ডি এম বোস ইউরোপ থেকে আধুনিক পদার্থবিদ্যার বেশ কিছু রসদ এনেছিলেন। তাছাড়া বসু এবং সাহা দুজনেই শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের প্রফেসর ব্রুলের বিশাল গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছিলেন, যেখানে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ ছিল। ১৯১৫ সালে আইনস্টাইন তাঁর সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের তত্ত্ব লোকসমক্ষে নিয়ে আসেন। ১৯১৯ সালে স্যার আর্থার এডিংটন সূর্যগ্রহণের সাহায্যে এই তত্ত্বের যাথার্থ্য প্রমাণ করে দেখান, যা রাতারাতি আইনস্টাইনকে বিজ্ঞানী থেকে এক মহানায়কে রূপান্তরিত করে। আইনস্টাইনের জীবনীকার আব্রাহাম প্যারিস তাঁর 'Subtle is the Lord' গ্রন্থে লিখেছেন, 'That day Einstein was canonised.' সারা বিশ্ব যখন তাঁকে নিয়ে মত্ত, তখন পৃথিবীর অন্য প্রান্তের এক কোণে বসু ও সাহা বসে এই পেপারের ইংরেজি অনুবাদ করলেন। আপেক্ষিকতাবাদের ইতিহাসে এ এক অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, কারণ এটিই ছিল আইনস্টাইনের কাজের প্রথম ইংরেজি অনুবাদ।

সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ যৌথভাবে আইনস্টাইন ও মিনকাউস্কি লিখিত আপেক্ষিকতাবাদের কয়েকটি মৌলিক নিবন্ধ জার্মান থেকে ইংরেজিতে প্রথম অনুবাদ করেন। সেগুলি প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ভূমিকা সহযোগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২০ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি বিজ্ঞানমহলে যথেষ্ট সমাদৃত হয়। সমস্ত প্রাচ্য দেশগুলিতে বইটি তখন পড়ানো হত ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভকালেও (১৯৩৯) বইটি পাওয়া যেত। কিন্তু পরবর্তী কালে দুর্ভাগ্যবশত বইটির আর পুনর্মুদ্রণ না হওয়ায় সেটি আজ বিলুপ্ত।

এরপর সত্যেন্দ্রনাথ ইউরোপ যেতে আগ্রহী হন, কিন্তু নানান বাধা আসে। সুযোগ্য হয়েও পালিত প্রফেসরের বৃত্তি তিনি পাননি, যেহেতু তিনি বিবাহিত। গুরুপ্রসন্ন ঘোষ বৃত্তিটি ছিল অল্প। মেঘনাদ তার সঙ্গে অন্য অর্থ যোগ করে পাড়ি জমান ইউরোপে। একে একে সকলে চলে যান। সত্যেন্দ্রনাথ পড়ে থাকেন একা। অথচ এমন প্রয়োজনের সময়ও তিনি ধনী শ্বশুরবাড়ি থেকে এক কপর্দকও নেননি। অবশেষে ডাক আসে হ্যারটগের মাধ্যমে—প্রত্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তাঁর এই বিলম্বিত যাত্রার পিছনে আরও কিছু প্রচ্ছন্ন কারণও ছিল। আত্মপ্রত্যয়ী স্পষ্টবাদী সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ব্যক্তিত্বের জন্য কিছু বিদগ্ধজনের মনের মতো হয়ে উঠতে পারেননি। থাকতে পারেননি স্যার আশুতোষ ও প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পছন্দের তালিকাতেও। অতএব নিজেকে ক্যালকেশিয়ান বলে গর্ববোধ করতেন যিনি, তিনিই অবশেষে কলকাতা ছেড়ে ঢাকা যেতে মনস্থ করলেন। সে-কথা জেনে স্যার আশুতোষ তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন, ''কেন যাচ্ছিস? তোর মাইনে বাড়িয়ে দিচ্ছি, এখানেই থাক।'' সত্যেন্দ্রনাথ বললেন, ''আমি যাব বলে কথা দিয়েছি।'' একথা শুনে আশুতোষ ক্ষুব্ধ হয়ে বলে ওঠেন, ''যা তুই, আমি নিজেই পড়াব।''

অবশেষে নতুন গড়ে ওঠা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরদর্শী ও পরিশ্রমী প্রথম উপাচার্য পি জে হ্যারটগের ডাকে সাড়া দিয়ে ১৯২১ সালে ঢাকা রওনা হন সত্যেন্দ্রনাথ। নিযুক্ত হন পদার্থবিজ্ঞানের রিডার পদে। এইসময় তিনি সংগঠনের কাজেও সাহায্য করতেন। এখানে থাকাকালীনই তিনি করে দেখালেন তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠতম কাজটি, যা বিশ্ববিজ্ঞানের ভিতটিকে নাড়িয়ে দিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন ১৯২৪-এর মার্চ-এপ্রিল নাগাদ তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ 'Planck's Law and the Light Quantum Hypothesis'

নামের বিখ্যাত পেপারটি লেখেন ও ব্রিটেনের নামকরা পত্রিকা 'ফিলজফিক্যাল ম্যাগাজিনে' পাঠিয়ে দেন। তারই অনুবর্তী 'Thermal equilibrium in the radiation field in the presence of matter' নামের আর একটি দ্বিতীয় পেপার পাঠিয়ে দেন। তিনি আশান্বিত থাকলেও জার্নালের তরফ থেকে কোনও উত্তর না আসায় নিজ কাজের প্রতি আত্মবিশ্বাসী সত্যেন্দ্রনাথ এবার এক দৃঢ় পদক্ষেপ নেন। প্রথম পেপারটিকে তিনি আইনস্টাইনের কাছে প্রেরণ করে তাঁর মতামত জানতে চান। তারপর পাঠান দ্বিতীয় পেপারটিকে। জহুরিই জহর চেনেন। আইনস্টাইন কাজটির গুরুত্ব বুঝে, সেটিকে নিজে জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে তাকে 'Zeitschrift fur Physik' নামের জার্মান জার্নালে প্রকাশ করান ও সত্যেন্দ্রনাথকে তাঁর উচ্চ গভীর মতামত জানান। রাতারাতি পট পরিবর্তন ঘটল। অখ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু রাতারাতি বিশ্ববিজ্ঞানজগতের উজ্জ্বল তারকায় রূপান্তরিত হলেন। হয়ে উঠলেন নব্য গবেষণা দুনিয়ার মধ্যমণি। এখন প্রশ্ন, কী সেই যুগান্তকারী কাজ যা আইনস্টাইনের মতো মানুষকেও টলিয়ে দিয়েছিল—তুলেছিল এমন আলোড়ন? সত্যেন্দ্রনাথের সেই যুগান্তকারী কাজের গুরুত্বের কথাটুকু এখানে একটু বলব।

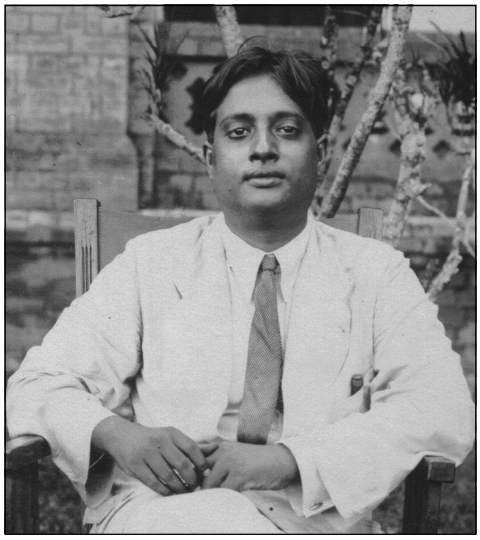

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সত্যেন্দ্রনাথ বসু

পদার্থবিজ্ঞানের ইতিহাসের আদি কাল থেকে বিকশিত চারশো বছরের গবেষণা ছিল গ্রহনক্ষত্র, তাদের গতিবিধি ইত্যাদিতে সীমাবদ্ধ। গ্যালিলিও-নিউটনের নিয়ম মেনে বিজ্ঞানীরা তাঁদেরকে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন সবটুকুই মিলে গিয়েছিল সুন্দরভাবে। গড়ে উঠেছিল ক্ল্যাসিক্যাল ফিজিক্স। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হয়। সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে ঘিরে মানুষের চাহিদা বাড়ে, জেমস ওয়াটের ইঞ্জিন ইত্যাদির মাধ্যমে ইউরোপে আসে শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)। পদার্থবিজ্ঞানে thermodynamics গভীরভাবে ঢুকে পড়ে। ম্যাক্সওয়েল, বোল্টজম্যান প্রমুখের সূত্র ধরে গবেষণা এগোয়। সবকিছুই ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু রুম হিটারের মতো অতি সাধারণ যন্ত্রের তাপ বিকিরণ প্রক্রিয়া বোঝাতে গিয়ে টলে যায় ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের বিগত চারশো বছরের আসন।

হিটার বা টোস্টারের লৌহতার উত্তপ্ত হলে প্রথমে মৃদু তাপ অনুভূত হয়। তারপর হালকা লাল ও গাঢ় লাল হয়। ধাপে ধাপে বাড়ে উষ্ণতা। অবশেষে সেখানেই থেমে যায় সে। কিন্তু যদি তাকে আরও উত্তপ্ত করা যেত তাহলে সে নীল (যেমন গ্যাসের আগুনের রং) ও অবশেষে সূর্যরশ্মির মতো সাদা হয়ে যেত। তাপের এ-হেন নিখাদ বিকিরণের নাম Thermal Radiation বা Black Body Radiation।

ম্যাক্সওয়েল, বোল্টজম্যান প্রমুখের সূত্র ধরে বিজ্ঞানীরা Black Body Radiation বোঝাতে ব্যর্থ হলেন। দেখা গেল যে তাঁদের সূত্র ধরে বোঝাতে গেলে উর্ষা অসীমের (Infinity) দিকে চলে যাবে,

যা হতে পারে না। কারণ উর্যা সংরক্ষিত থাকে। গবেষণাগার থেকে Black Body Radiation-এর যে-রূপ নির্ধারিত হল, সেটি কোনওভাবেই সূত্র দিয়ে বোঝানো গেল না।

এমন পরিস্থিতিতে ১৯০০ সালে প্লাঙ্ক একটি যুগান্তকারী পেপার দিলেন, যা প্রযুক্তির হিসেবটিকে মিলিয়ে দিল। ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স থেকে সরে প্লাঙ্কের এই প্রতিপাদ্য এক নতুন দিকে আলোকপাত ঘটাল। তিনি বললেন, বস্তু থেকে নির্গত তাপের বিকিরণ অবিচ্ছিন্ন নয়, উপরন্তু ছোট ছোট ঢেলায় বিচ্ছিন্নভাবে বের হয়। প্লাঙ্ক তাঁর সূত্রটিকে কিছুটা চিরায়ত (Classical) ও কিছুটা আধুনিক ধারায় তৈরি করে Black Body Radiationকে বোঝাতে পারলেন ও তাঁর সূত্রটিকে 'Planck's Law of Black Body Radiation' নামে প্রকাশ করলেন। এরপরের পদক্ষেপ নিলেন আইনস্টাইন। ১৯০৫ সালে তিনি জানালেন, তাপের বিকিরণ যখন মহাশূন্য দিয়ে যাচ্ছে, তখনও যাচ্ছে ঢেলার মধ্য দিয়ে। এই ধারাকে ভিত্তি করে তিনি photoelectric effect-কে বোঝাতে সক্ষম হলেন, যা কিনা ক্লাসিক্যাল রীতিতে সম্ভব হচ্ছিল না। নামের মধ্য দিয়ে এই ধারাকে বোঝানো যায়। Photoelectric, অর্থাৎ আলো ঢুকল আর বিদ্যুৎ বার হল। সোলার সেল তার একটি উদাহরণ। এরপর ১৯১৩ সালে কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে নিলস বোর হাইড্রোজেন অ্যাটমের স্থায়িত্ব বোঝালেন, যা এমনিতে সম্ভব ছিল না। প্রত্যেকেই নিজের নিজের যুগান্তকারী কাজের জন্য নোবেল প্রাইজ পেলেন। তবু সব কিছু হয়েও যেন কেমন একটা ফাঁক থেকে গেল। থেকে গেল আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের পথে কিছু অপূর্ণতা। সেই সময়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে, মধ্য ইউরোপই ছিল শিক্ষাসাধনার মূল কেন্দ্রবিন্দু। বড় বড় বিজ্ঞানীরা সবাই বুঝতে পারছিলেন যে নব আবিষ্কৃত এই কোয়ান্টাম তত্ত্বের মধ্যে কোথাও একটা অসম্পূর্ণতা আছে। কারণ প্লাঙ্কের ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশন-এর সূত্র সম্পূর্ণভাবে কোয়ান্টাম তত্ত্ব দিয়ে বোঝা যাচ্ছিল না। কিন্তু কেউই সে-ফাঁকটুকু পূরণ করতে পারছিলেন না।

এমন পরিস্থিতিতে এগিয়ে এলেন ঢাকার প্রত্যন্ত প্রান্তরে বসে থাকা বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। এক বৈপ্লবিক চিন্তাধারার প্রবর্তন করলেন ১৯২৪ সালে। তিনি এক নতুন গণনাপদ্ধতির অবতারণা করলেন। আগের গণনাপদ্ধতিতে কণাকে পার্থক্যযুক্ত হিসেবে ধরা হত। কিন্তু নতুন পদ্ধতিতে তাদের পার্থক্যহীন ধরা হয়, অর্থাৎ তাদের মধ্যে প্রভেদ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই নতুন নিয়মের মাধ্যমে সত্যেন্দ্রনাথ প্লাঙ্কের ব্ল্যাক বডি রেডিয়েশনের নতুন প্রমাণ দিলেন, যেটি সম্পূর্ণ কোয়ান্টাম তত্ত্বের ওপর নির্ভরশীল। অবশ্য এই নতুন প্রমাণের থেকেও যেটি বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি তাঁর ভেদবিহীনতার (Indistinguishability) বৈপ্লবিক চিন্তন। কারণ কণাদের মধ্যে তফাত না করতে পারলে তারা আর স্বাধীন থাকতে পারে না। অতএব যেখানে বেশি কণা আছে সেখানে অন্যরাও ঢুকতে চায়। স্বাধীনতা-বর্জিত ফারাকহীন কণাগুলি একত্রিত হতে বা cluster করতে চায়। তাঁর এই চিন্তন পদার্থবিজ্ঞানের জগতে বিশাল পরিবর্তন আনল। Statistical Physics-এর পুরনো ভাবধারাটাই পালটে গেল। হারিয়ে গেল এতদিনের প্রতিষ্ঠিত বিচ্ছিন্নতাবাদের (randomness) তত্ত্ব। জন্ম নিল বসুর নামকে আধার করে 'বসু পরিসংখ্যান'। আর যে-কণাগুলি এই পরিসংখ্যান মেনে চলে তাদের Boson নাম দেওয়া হল। এই তত্ত্ব কাজে লাগিয়ে আইনস্টাইন, ফারমি, ডিরাক, পাওলি—সবাই নতুন কোয়ান্টাম তত্ত্ব তৈরি করলেন। প্রতিষ্ঠিত হল Quantum Field Theory। সেই হিসাবে সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরির জনক

বলা যেতে পারে।

এখানে উল্লেখ্য, বিশ্বের প্রথিতযশা তাত্ত্বিক পদার্থবিদ, ভারতীয় বংশজাত সদ্য প্রয়াত জর্জ সুদর্শন বলেছেন যে, আইনস্টাইনকে পাঠানো বসুর দ্বিতীয় পেপারটিও ছিল গুরুত্বপূর্ণ। যেহেতু আইনস্টাইন সেটিকে গুরুত্ব দেননি, তাই অন্যদের কাছেও তা গুরুত্ব পায়নি। তিনি আরও বলেছেন, দ্বিতীয় পেপারটিতে আইনস্টাইনের আগের কাজকে বসু আরও বিস্তারিত করেছিলেন। বসুর পেপারগুলি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে আইনস্টাইন, বসুকে না জানিয়ে, তিনটি পেপার লেখেন। এখানে তিনি দেখান যে বসুর নতুন পরিসংখ্যান মেনে চললে, খুব নিম্ন তাপমাত্রায় (চরম শূন্যের কাছে) কোনও গ্যাসের কণাগুলি ঘনীভূত হবে। একে 'Bose Einstein Condensation' বলা হয়। পদার্থের এই নতুন রূপ ১৯৯৪ সালে আবিষ্কৃত হয়। আবিষ্কারকেরা ২০০১ সালে ভূষিত হন নোবেল পুরস্কারে।

সত্যেন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত আবিষ্কার রাতারাতি বড় পরিবর্তন এনেছিল তাঁর জীবনে। সব বাধা দূরীভূত হল। তিনি দুবছরের জন্য ইউরোপ যাওয়ার সুযোগ পেলেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম বিশ্ববিদ্যালয়ে ও গবেষণাগারে কাজ করার সুযোগ পেলেন অবাধে। রাতারাতি হয়ে উঠলেন বিশ্ব বিজ্ঞান মঞ্চের মধ্যমণি। কিন্তু চিরনির্লিপ্ত ও নামযশের আকাঙ্ক্ষা-বিমুখ সত্যেন্দ্রনাথ কি আপ্লুত হয়েছিলেন তাতে? শেষ প্রশ্নের উত্তর মেলে বিজ্ঞানী সি ভি রমনের ছাত্র এস রামাশেষনের কাছ থেকে। তিনি সত্যেন্দ্রনাথের কাছে তাঁর এই বিপুল আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে তাঁর আত্মতৃপ্তি ও আনন্দের খবর জানতে চেয়েছিলেন। তাতে সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনোভাবটি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। যদি মনে কর যে তোমার খুব পেটব্যথা বা মাথাব্যথা করছে, আর হঠাৎ তা চলে যায়, সেইরকমই মনের অবস্থা হয়েছিল আমার। কারণ এর আগের কাজের ব্যুৎপত্তিগুলি ক্রমাগত অগাধ কষ্ট দিচ্ছিল আমাকে। তুমি যদি মনে কর ব্যথা থেকে মুক্তি আনন্দদান করে, তো সেই অর্থে আমি আনন্দিত ছিলাম। একথাও ঠিক যে আমি কখনই ভাবিনি আমি বিরাট কাজ করে দেখিয়েছিলাম।''

সত্যেন্দ্রনাথ একাধারে ছিলেন বড় বিজ্ঞানী ও বৃহৎ মানুষ। সি ভি রমনকে তিনিই প্রথম তাঁর কাজের সুখ্যাতি করে তাঁর নোবেল জয়ের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন। তাঁর হৃদয়ের ব্যাপ্তির সঙ্গে তাঁর কাজেরও ব্যাপ্তি ছিল বিশাল। নিজ বিষয় Mathematical Physics-এ এমন পারঙ্গম হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাতে সীমাবদ্ধ না থেকে ঢাকায় থাকাকালীন নিজ ছাত্র ও সহকর্মীদের X-ray spectroscopy, X-ray diffraction, Magnetic properties of matter, Optical spectroscopy including Raman spectra, Wireless ইত্যাদির মতো নতুন গবেষণামূলক কাজে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দিতেন ও সাহায্য করতেন। যে-কেউ তাঁর সংস্পর্শে এসেছে, পেয়েছে তাঁর ক্ষণজন্মা প্রজ্ঞার আভাস। বিজ্ঞান-গবেষক প্রতুল রক্ষিত তাঁর স্মৃতিচারণে জানিয়েছেন, যে-কেউ তাঁর কাছে যে-ধরনের অঙ্কই নিয়ে যান না কেন, তিনি তা কষে দিতেন অনায়াসে। বিজ্ঞানের জটিলতা ছিল তাঁর খেলার সঙ্গী, তাঁর ভালবাসা! ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন রিডার কে এস কৃষ্ণন তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, ''ডক্টর বোস জটিল সমীকরণ কষতে আনন্দ পান। সেটি সমাধান করলেই তাঁর উৎসাহ হারিয়ে যায়। প্রামাণিক তথ্যগুলিকে তিনি আবর্জনার বাক্সে নিক্ষেপ করেন, জার্নালে পাঠানোর পরিবর্তে।''

আগেই বলেছি, বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের হৃদয় ছিল দেশাত্মবোধক ভাবনায় পূর্ণ ও পরাধীন দেশের

প্রতি দরদে আকুল। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি ঘটনার কথা স্মরণ করা যাক, যেটি তিনি নিজে স্মৃতি রোমন্থন করে বলেছেন। একবার আইনস্টাইন তাঁর সামনে আলোচনাপ্রসঙ্গে ব্রিটিশদের উন্নত জাতিরূপে প্রশংসা করে জিজ্ঞেস করেন, ''তোমার কি মনে হয় যে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগ করা উচিত?'' সত্যেন্দ্রনাথ সগর্বে উত্তর দেন, ''নিশ্চয়ই, আমরা নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য গড়তে চাই।'' উত্তর শুনে আইনস্টাইনের প্রত্যয় হল না। তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে বললেন, ''মনে কর তোমার কাছে এমন একটি বোতাম আছে, যেটি টিপলে মুহূর্তে সমস্ত ব্রিটিশ দেশত্যাগী হবে, তাহলে কি তুমি সেটি টিপবে?'' সত্যেন্দ্রনাথ অল্প হেসে উত্তর দিলেন, ''যদি দেবতা আমাকে এমন কোনও সুযোগ দেন, আমি সেটি টিপতে এক মুহূর্তও বিলম্ব করব না।'' আইনস্টাইন অবাক হয়ে বলে উঠলেন, ''সত্যি?'' পরমুহূর্তে আইনস্টাইন নীরব হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। সত্যেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করলেন, ''আপনারা ইহুদিরা তাহলে কেন নতুন ইজরায়েল দেশ গড়তে চাইছেন? আপনার নিজেরও মনে হয় এ-ব্যাপারে যথেষ্ট আগ্রহ আছে।'' উত্তরে আইনস্টাইন জানালেন, ''ঠিকই, মনে হয় আমি এখন তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি—এটি একটি আবেগ সংক্রান্ত বিষয়, যাকে যুক্তি দিয়ে বোঝা কঠিন।'' মাত্র এই একবারই সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর গুরু আইনস্টাইনের মুখের ওপর কথা বলেছিলেন। তিনি তাঁর সঙ্গে বৈজ্ঞানিক মতামতের পার্থক্যকে নিজের মনেই পুষে রাখতেন। তাঁর অন্তরে তাঁর গুরু আইনস্টাইনকে কেন্দ্র করে একটি গভীর মর্মবেদনা ও অভিমান ছিল যে, আইনস্টাইন তাঁর পরবর্তী নতুন চিন্তনগুলিকে, যেগুলি পরে সঠিক প্রমাণিত হয়েছে, কোনও মূল্য দেননি। একবার নাকি তিনি বলেওছিলেন, ''Einstein made me, Einstein finished me.''

সত্যেন্দ্রনাথের মধ্যে প্রবল দেশাত্মবোধ ছিল। পরাধীন দেশের ব্যথায় ব্যাকুল ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সত্যেন্দ্রনাথ দুবছর ইউরোপে থেকে অজস্র দেশ ঘুরে কাজ করেও একটি দিনের জন্যও ইংল্যান্ডে যাননি। ততদিন পা রাখেননি ওই দেশে, যতদিন না ভারত স্বাধীনতা পেয়েছে। এই তেজ, এই জেদ ও দেশের প্রতি একনিষ্ঠতার প্রেরণা তিনি পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের কাছ থেকে। তিনি অল্প বয়স থেকেই ছিলেন একনিষ্ঠ বিবেকানন্দ-অনুরাগী। স্বামীজীর সঙ্গ তিনি পাননি, কারণ যখন তাঁর বয়স মাত্র আট বছর, তখনই স্বামীজীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। কিন্তু বহু মনীষীর মতো তিনিও স্বামীজীর অবর্তমানেও তাঁর শক্তি-প্রবাহের ধারাকে অনুভব করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, ''তাঁর (বিবেকানন্দের) নিজের মধ্যে যে অসীম শক্তির উৎস ছিল, তা সবসময় প্রকাশের পথ খুঁজত। সমস্ত জীবন এই অদম্য শক্তি তাঁকে পৃথিবীময় তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। আর যেখানেই তিনি গিয়েছেন সেখানেই মানুষ তাঁর মধ্যে এই প্রাণের প্রবাহ দেখে নিজেরাও উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। আমাদের দেশের মানুষকে তার মোহনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তোলার কাজে সে যুগে তাঁর চেয়ে যোগ্যতর ব্যক্তি কেউ ছিলেন না।''

স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানমনস্কতা ও আধ্যাত্মিকতার এক অভূতপূর্ব সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছিলেন। এ-প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় তাঁর সঙ্গে শংকরাচার্যের তুলনা করে লিখেছেন, ''আমাদের দুর্ভাগ্য, ভারতের আর এক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্যের মতো বিবেকানন্দ অকালে দেহত্যাগ করেন। কিন্তু শঙ্কর যেমন তাঁর সেই স্বল্পকালস্থায়ী জীবনের মধ্যে সারা ভারত বারবার পরিক্রমা করে ভারতীয়দের মধ্যে নতুন প্রাণরস সঞ্চার করার চেষ্টা করেছিলেন, স্বামীজীও তেমনি ঊনবিংশ শতাব্দীতে ঝড়ের মতো ভারত ও

পশ্চিমের দেশগুলি পরিভ্রমণ করে রামকৃষ্ণদেবের সর্বধর্মমত-সমন্বয়সাধনের নতুন বাণী প্রচার করেছিলেন। গোঁড়ামিমুক্ত তাঁর এই নতুন ধর্মমতই শিকাগোতে এবং পরবর্তী কালে পশ্চিমকে এত অভিভূত করেছিল।''

সহজ-সরল মানুষ সত্যেন্দ্রনাথকে যে যখন যেখানেই ডাকত, সেখানেই বিনা দ্বিধায় এসে উপস্থিত হতেন। সাহিত্য পরিষদ স্ট্রিটের বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সমিতি আয়োজিত বহু সভায় উপস্থিত হয়ে তিনি স্বামীজীর উদ্দেশে প্রাণভরা শ্রদ্ধাভক্তি উজাড় করে বক্তৃতা করেছেন। মৃত্যুর সামান্য কিছুদিন আগেও অসুস্থ শরীরে তিনি আজাদ হিন্দ বাগের বিবেকানন্দ জন্মোৎসব সভার উদ্বোধন করতে আসেন। প্রদীপ জ্বালানোর সময় তিনি ভাবাবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বলেছিলেন, ''আর কি প্রদীপ জ্বালাতে আসতে পারব?'' পারেননি, কারণ তাঁর জীবনদীপ নিভে গিয়েছিল তার অনতিকাল পরেই।

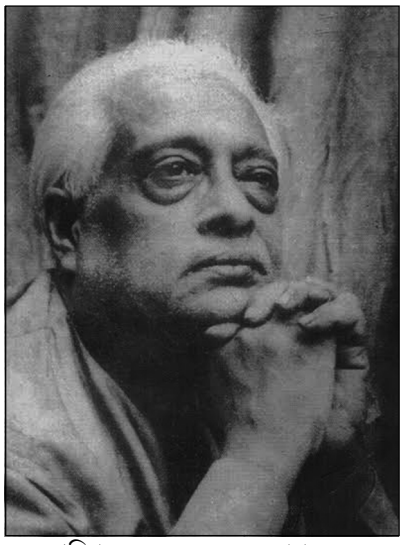

পরিণত বয়সে সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সত্যেন্দ্রনাথের অন্তরে দেশ, জাতি ও ভাষার প্রতি প্রবল আবেগপ্রবণতা পরিণত বয়সে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ১৯৬২ সালে অ্যাটম বোমা নিক্ষেপের দিনটিকে স্মরণে রাখার জন্য জাপানে 'বিজ্ঞান ও দর্শন'-এর উপর একটি সেমিনার আয়োজিত হয়। সেই উপলক্ষ্যে সত্যেন্দ্রনাথ আমন্ত্রিত হন সেখানে। অনেক কিছুর মধ্যে জাপানিদের নিজের ভাষায় শিক্ষাদানের রীতি তাঁকে বহু আগে থেকেই আকর্ষণ করত। সেই ধারাটিকে তিনি কাজে লাগান ও ২৫ জানুয়ারি ১৯৪৮ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের স্থাপনা করেন, যেখানে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞানচর্চাকে উৎসাহিত করা হবে ও বিজ্ঞানকে পৌঁছে দেওয়া হবে বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে প্রতিটি ঘরে।

সবার উপরে তিনি ছিলেন এক বিরল মানুষ, নিজ সাধনায় আত্মমগ্ন। তাঁর এই আত্মভোলা মনের আভাস মেলে পদে পদে। তার মধ্যে একটি হল এই যে, তিনি বেশিরভাগ পত্রে কোনও তারিখ লিখতেন না। ভুলে যেতেন তাঁর সমীকরণগুচ্ছকে নথিভুক্ত করতে। ফলে বহু ক্ষেত্রেই তাঁর কাজের সময়সীমাকে ধার্য করা যায় না। বোঝা যায় না যে সে-কাজ আইনস্টাইন প্রদত্ত স্বীকৃতির আগে না পরে।

এখানে একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ করি। বসুর দ্বিতীয় পেপারের যে-সমালোচনা আইনস্টাইন করেছিলেন, তার উত্তরে বসু তৃতীয় একটি পেপার লিখে আইনস্টাইনকে পাঠান। কিন্তু আইনস্টাইন সেটি ছাপাতে দেননি। সেই পেপারটি হারিয়ে গেছে, কারণ বসু নিজের কাছে পেপারের কপি রাখতেন না। আরও উল্লেখ্য, বসু তাঁর দুবছর ইউরোপে বসবাসকালে কোনও পেপার লেখেননি। তবে জেরুজালেমে আইনস্টাইন সংরক্ষণশালায় বসুর দু-পাতার একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ calculation সংগৃহীত আছে। তারিখবিহীন এই দুটি পাতার শিরোনামে শুধু 'বোস' আর 'Fluctuation in density' লেখা আছে। শেষে তিনি যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন, সেই একই সিদ্ধান্তে আইনস্টাইন পৌঁছেছিলেন, যখন তিনি বসুর প্রথম পেপারের পর কয়েকটি পেপার লেখেন।

বিরল ব্যক্তিত্বশালী সত্যেন্দ্রনাথ নিজ সাধনার জগতে প্রকৃতরূপে ছিলেন অনন্য ও অভিজাত। অথচ ছিলেন সহজ সরল—যথার্থই শিশুসুলভ। সকলকে আপন করে নেওয়ার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল তাঁর। যে-কোনও জিজ্ঞাসুপ্রাণের জন্য তাঁর গৃহের দ্বার ছিল অবারিত। শ্রীমতী মহলানবীশ ঠাট্টা করে বলতেন, তাঁর ঘর হল শ্যামবাজারের পাঁচমাথার মোড়।

সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন দেবাদিদেব শিবের মতোই নির্লিপ্ত, আত্মভোলা ও প্রচারবিমুখ। সবসময় যবনিকার পিছনে থাকতেই ভালবাসতেন। নিজেকে কোনওভাবে জাহির করা ছিল তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ। তাঁর এই অনন্য ব্যক্তিত্বের রূপটি ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ ও সম্পর্কের কালে। অল্পবয়স থেকেই তিনি ছিলেন গুরুদেবের ভক্ত। বন্ধু মানিকলাল দের সঙ্গে তিনি প্রায়ই বিচিত্রা ক্লাবের অনুষ্ঠান শুনতে যেতেন জোড়াসাঁকোতে। কিন্তু তরুণ সত্যেন্দ্রনাথ কখনই কবিগুরুর সামনা-সামনি আসেননি। আবার সাক্ষাতের সুযোগ এসেছিল ইউরোপে ১৯২৪ সালে, যখন সত্যেন্দ্রনাথ প্যারিসে। রবীন্দ্রনাথ তখন ইউরোপ ভ্রমণে এসেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ জানতেন সেকথা। তিনি নিজেও তখন জগদ্‌বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তবু নিজের পরিচয়পত্র নিয়ে যাননি তাঁর সামনে।

তাঁদের প্রথম পরিচয় হয় ঢাকায়। রবীন্দ্রনাথ সেখানে ইতিহাসবিদ রমেশচন্দ্র মজুমদারের অতিথি হয়ে এসেছিলেন। কবির ইচ্ছেমতো তাঁকে বজরায় রাখা হয়েছিল। স্বাভাবিকরূপেই তাঁর অনুবর্তী হয়েছিল বিশাল ভক্তের দল। তারা দলে দলে নৌকায় গিয়ে গুরুদেবের দর্শন করে আসছিল। ড. মজুমদার ও তাঁর স্ত্রী তীরে থেকে নিরলসভাবে সবকিছুর তত্ত্বাবধান করছিলেন। গৃহে তাঁদের ছোট ছেলেমেয়েরা তখন অভিভাবকহীন ও একা। অতএব তাঁদের দুই বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ ও জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ গৃহের ভার নিলেন ও আগলালেন তাঁদের সন্তানদের। এমনই নেপথ্যকামী ও নিরহংকার পুরুষ ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। কিন্তু হীরের জৌলুসকে তো আর চাপা দিয়ে রাখা যায় না! পরে রবীন্দ্রনাথ নিজেই এগিয়ে এলেন ১৯৩৭ সালে। বরেণ্য বিজ্ঞানীকে বরণ করলেন তাঁর পুস্তক 'বিশ্ব পরিচয়' উপহার দিয়ে।

অগাধ গুণের আধার ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ। ছিল অজস্র বিষয়ে দক্ষতা। সুনিপুণ হাতে এসরাজ বাজাতেন। এক নতুন রাগের সৃষ্টিও করেছিলেন। কিন্তু এত সব সত্ত্বেও তাঁর একটিই পরিচয়—তিনি এক বিজ্ঞানী। এ-বিশ্বে নোবেল প্রাইজ যদি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মাপকাঠি হয়, তবে তিনি তা পাননি। তা নিয়ে অনেকে হা-হুতাশও করেন। কিন্তু এ-বিশ্বের যা কিছু গবেষণা নোবেলের পরিসীমাকে ছাড়িয়ে গেছে ও হয়ে গেছে চন্দ্র-সূর্য-তারকার মতো চিরায়ত ও সত্য—সেই পর্যায়ের গবেষণার পঙ্‌ক্তিতে নথিভুক্ত হয়ে রয়েছেন সত্যেন্দ্রনাথ। অথচ তাঁর শিশুসুলভ সরল ও অমায়িক ব্যক্তিত্ব দেখে সেকথা বোঝার উপায় নেই। হয়তো তাঁরাও অনেকে বোঝেননি, যাঁরা সৌভাগ্যক্রমে এক সময় তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন।

সবশেষে এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করব। স্বনামধন্য রাশিয়ান পদার্থবিদ, নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী লেভ ল্যানডাউ তাঁর নিজের বিচারে বিশ্বের পদার্থবিদদের একটি তালিকা তৈরি করেছিলেন। সেটি তিনি পকেটে নিয়ে ঘুরতেন। বহুজন জানত সেকথা, এবং অনেকের এই তালিকাকে ঘিরে ছিল অগাধ কৌতূহল। এ-বিষয়ে নানান বক্তৃতাও হয়েছে। ল্যানডাউ এই আকর্ষণীয় তালিকায় সর্বোচ্চ স্থানে রেখেছিলেন নিউটন ও আইনস্টাইনকে। তার ঠিক নিচে নথিভুক্ত ছিলেন বোর, হাইজেনবার্গ, শ্রোডিংগর, প্লাঙ্ক, পাওলির মতো নোবেলজয়ী যুগান্তকারী পদার্থবিদেরা ও

তাঁদের পাশে সত্যেন্দ্রনাথ। ল্যানডাউ নিজেকে আরও নিচে রেখেছিলেন।

১৯২৪ সালে সত্যেন্দ্রনাথ অবিচ্ছিন্নতাবাদের যে-তত্ত্বটি দিলেন, যার ফলে বিভিন্ন কণাগুলি আর স্বাধীন থাকে না—সেইটিই হল কোয়ান্টাম তত্ত্বের মূল কথা। আক্ষরিক অর্থে আধুনিক কোয়ান্টাম তত্ত্বের জন্মদাতা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু। আজ তাঁর একশো পঁচিশতম জন্মবার্ষিকীতে আবার তাঁর কথা নতুন করে স্মরণে আসে। মনে পড়ে কী অদ্ভুত প্রতিকূলতার মাঝে, পরাধীন দেশে মলিন গৃহকোণে বসে তিনি বিশ্ববিজ্ঞানের কত বড় আবিষ্কার করে দেখিয়েছিলেন! নাড়িয়ে দিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানের শিলাটিকে, অতি অনায়াসে।

বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কর্মই দেবতা হয়ে তাঁর পূজার বেদি জুড়ে বসেছিল। যে-পূজায় পূজক সত্যেন্দ্রনাথ অনন্যমন হয়ে নিজেকে অর্পণ করেছিলেন তাঁর জীবনদেবতার শ্রীচরণে। সেই দেবতাই তাঁকে বিজ্ঞানীমহলে মানুষের মাঝে অমরতা দান করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ

১। Leon M. Lederman, *Quantum Physics for Poets* (Nobel Laureate), Christopher T. Hill, (Prometheus Books, 2011)

২। Edited by Kameshwar C. Wali, *Satyendranath Bose, His Life and Times, Selected works* (Nobel Laureate), Christopher T. Hill, (Prometheus Books, 2009)

৩। Abraham Paris, *Subtle is the Lord... The Science and Life of Albert Einstein* (Oxford University Press, 1982)

৪। Editors, C. K, Majumdar, Partha Ghosh, Enakshi Chatterjee, Samik Bandopadhyay, Santimoy Chatterjee, *S.N Bose, The Man and His Work*, Part II, (Life, Lectures and Addresses, Miscellaneous Pieces), (S.N. Bose National Centre for Basic Sciences, 1994)

৫। রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, *বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু* (শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানি : কলকাতা, ১৩৭১)

৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, খণ্ড ৭ (মণ্ডল বুক হাউস : কলকাতা, ১৯৮৮)

বিশেষ সহায়তা : অধ্যাপক রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ বসু জাতীয় মৌলিক বিজ্ঞান কেন্দ্র, কলকাতা।

শ্রীসারদা মঠ থেকে প্রকাশিত কয়েকটি বই

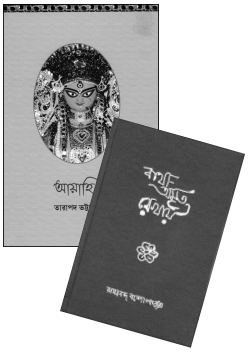

আয়াহি • শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য

দুর্গাপূজার প্রাক্‌লগ্নে দেবীর পুণ্য আগমনীর বার্তা বহন করে আনে শরতের প্রকৃতি। মানুষের মনেও দেবীর তত্ত্ব জানার, তাঁর লীলাকথা শোনার আগ্রহ জাগে। সে আগ্রহ পূরণ করেছেন স্বনামধন্য পণ্ডিত শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য। **মূল্য: ৫০ টাকা।**

কথা-অমৃত রেখায় • শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীরামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা কথামৃতের পঁচিশটি উপদেশে ঋদ্ধ পুস্তক। আর্ট পেপারে সাদা-কালোয় স্কেচ, প্রতিটি ছবিই শিল্পীর গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধার প্রকাশ। **মূল্য: ৮০ টাকা।**